International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Volume-III, Issue-II, September 2016, Page No. 33-41
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com

জাপান ভ্রমণে রবীন্দ্রনাথ

মামনি মাহাত
ছাত্রী গবেষক, রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়, রাঁচি, ঝাড়খণ্ড, ভারত

Abstract

Wander thirst Rabindranath, in addition to East has travelled in many countries of the West. His experiences on travel have become illuminated in distinct greatness. The picturesque elements of social, political, economical, geographical in addition to the then civilization, culture, education, literature, art have been reflected in his travelogues for diverse experiences during travelling . The notable countries of the East are China, Japan, Parassa, Singhall, etc. and the island like Java, Bali, etc. From his self composed letter we know about his purpose of travelling to Japan. The three objectives of his tour to Japan have been observed–the exploration of original source for the awakening of the modern Japan from the past tradition, the reclamation of Indian tradition from Japanese civilization and retrieval of knowledge about Japanese literature .So with the close perceivance of Japanese civilization and culture during his tour Japan ,he tries to find similarity of Indian civilization with the civilization of this oriental country. He has draw real and vivid picture of the women mentality, comeliness, firmness, of character, religion, art, literature of the Japanese. His eyes does not escape the instances of selfness love and peacefulness of the Japanese. During his journey to Japan he has drunk the flavor of nature to his heart's content. In his natural description he is able to make complete development of inherent entity going into the depth of human mind with the company of different kinds of people. The fruition of ' Bsudhebo Kutumbokam' is seen through world tour. To know and experience the world variously and to have it within himself have been reflected in the essence of his travelogues. He has wanted to discover the universal and integrated humanity highly criticizing the aggressive and nationalism against humanity. He has criticized the aggressive mentality of the Japanese Govt. towards China overall, he has dreamt on the recovery of the ethical ideology of mankind through education and literature harking the messages of humanity to the war-affected and righteous people of Japan.

Key Words: Exploration, travelogues, nationalism, civilization, diverse experience, tradition, humanity.

ভ্রমণ পিয়াসী রবীন্দ্রনাথ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশে ভ্রমণকালে তৎকালীন প্রেক্ষাপটে সেখানকার সামাজিক সাংস্কৃতিক, ভৌগোলিক, রাজনৈতিক, ও অর্থনৈতিক অবস্থার বাস্তবচিত্র প্রতিফলিত করেছেন। তিনি ছিলেন বিশ্বকবি বিশ্বমানব। তিনি জাপান ভ্রমণের বৃত্তান্ত তাঁর ভ্রমণ সাহিত্যে লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি তাঁর ভাববাণী দেশ

বিদেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে দিতে ব্যস্ত ছিলেন। তাঁর পুত্রকে লেখা একটি চিঠিতে তার প্রমাণ আছে। চিঠির অংশ বিশেষ উল্লেখ করা হল- "আমার পক্ষে এই ঘুরপাক নিতান্তই ক্লেশকর, সমস্ত সহ্য করছি এই মনে করে যে, বিধাতার বাণী এদের কাছে বহন করবার আদেশ আমার উপর আছে। তার পরে এও আমার মনে আছে যে, শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়কে বিশ্বের সঙ্গে ভারতের যোগের সূত্র করে তুলতে হবে-ঐখানে সর্বজাতিক মনুষ্যত্ব চর্চার কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে- স্বজাতিক সংকীর্ণতার যুগ শেষ হয়ে আসছে-ভবিষ্যতের জন্যে যে বিশ্বজাতিক মহামিলন যজ্ঞের প্রতিষ্ঠা হচ্ছে, তার প্রথম আয়োজন ঐ বোলপুরের প্রান্তরেই হবে"।[১] জাপান যাত্রাকালে প্রকৃতির অন্ধকারে গূঢ়ার্থ ব্যাখা করেছেন 'কল্পনা' কাব্যের 'রাত্রি' কবিতায়। এই অন্ধকারের রোমাঞ্চ তাঁর মনে গভীর ছায়া ফেলেছিল।তিনি বলেছেন- "জগতের সেই সব যামিনীর জাগরু কদল

সঙ্গীহীন তব সভাসদ
কে কোথা বসিয়া আছে আজি রাত্রে ধরণীর মাঝে,
গণিতেছে গোপন সম্পদ-
কেহ কারে নাহি জানে, আপনার স্বতন্ত্র আসনে
আসীন স্বাধীন স্তব্ধচ্ছবি-
হে শর্বরী, সেই তব বাক্যহীন জাগ্রত সভায়,
মোরে করি দাও সভাকবি।"[২]

এইভাবে জাপানের বিভিন্ন বিষয়গুলি তাঁর ভ্রমণ সাহিত্যের রসধারায় অভিসিঞ্চিত হয়ে বিশ্বমানবের সাহিত্যরস সামগ্রী হয়ে উঠেছে। এখানে তাঁর জাপান ভ্রমণ নিয়ে আলোচনা করা হল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯১৬, ১৯১৭, ১৯২৪, ১৯২৬ সালে মোট চারবার জাপান যান। তিনি প্রথমবার ১৯১৬ সালে তোসামারু নামক জাহাজে ২০শে বৈশাখ জাপানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। 'জাপানযাত্রী' রচনায় তিনি বোম্বাই থেকে কিভাবে জাপান যান সেই যাত্রা পথের বর্ণনা সুন্দরভাবে দিয়েছেন। তার পাশাপাশি ফুটে উঠেছে তৎকালীন প্রেক্ষাপটে জাপানের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা, রাজনৈতিক, অথনৈতিক ও ভৌগোলিক দিকগুলি। রবীন্দ্রনাথ যখন জাপানে যান তখন জাপানের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা বিপুলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। জাপানের এই দুর্দিনে জাপানের সামাজিকত, সাংস্কৃতিক, শিল্প, স্থাপত্য ও সাহিত্যের ক্ষেত্রেও প্রভাব পড়েছে। ডঃ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর 'রবীন্দ্রজীবনী'তে জাপানের এই দুর্দিনের কথা উল্লেখ করেছেন- "কবি যখন জাপানে পৌঁছিলেন, তখন নানা দিক হইতে জাপানের দুর্দিন। কিছুকাল পূর্বে (১৯২৩ সেপ্টেম্বর এবং পুনরায় ১৯২৪ জানুয়ারী ১৫) ভূমিকম্পের ফলে জাপান ধনে জনে বিপুলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত; আমেরিকার সহিত প্রাশান্তমহাসাগরের আধিপত্য লইয়া রাজনৈতিক সম্বন্ধ অত্যন্ত জটিল। আমেরিকায় প্রবেশাধিকার সংকুচিত করিবার জন্য নানাপ্রকার বিধিবিধান রচনায় মার্কিনরা প্রবৃত্ত"।[৩] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জাপানের ভারসাম্যহীনতার কথা স্মরণ করে দুঃখ প্রকাশ করেছেন। আর জাপানবাসীর সেই নৈতিক আদর্শ পুনরুদ্ধারের স্বপ্ন দেখেছেন। ডঃ সন্তোষ কুমার মন্ডল এ বিষয়ে মন্তব্য করেছেন - "শিক্ষা ও সাহিত্যের মানসকর্ষণার মধ্য দিয়ে মানুষের নৈতিক আদর্শের পুনরুদ্ধারের স্বপ্ন দেখেছেন। তিনি আশা করেছি্লেন জাপান সেই স্বপ্নকে সার্থক করে তুলবে। কিন্তু জাপানের সাম্রাজ্য লিপ্সায় তিনি মর্মাহত হন। তবে তিনি বিশ্বাস করেন সুশিক্ষা ব্যতীত রাজনৈতিক, মানবিক, অথনৈতিক কোন রকম সমস্যারই সমাধান সম্ভব হবে না"।[৪]

জাপান যাওয়ার পথে তিনি যে সামুদ্রিক ঝড়ের কবলে পড়েন তারও বর্ণনা সুন্দরভাবে দিয়েছেন। সামুদ্রিক ঝড় জাহাজকে টলিয়ে দিচ্ছে বারবার। মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। জাপানী মাল্লারা ছুটোছুটি শুরু করে দিয়েছে। তিনিও ভয় পেয়ে বড়োর উপর ভরসা রাখাই ভালো বলে মনে করেছেন- "এত তুফানেও যে আমাদের ডেকের উপর আছড়ে আছড়ে ফেলছে না তার কারণ, জাহাজ আকণ্ঠ বোঝাই। ভিতরে যার পদার্থ নেই তার মতো দোলায়িত অবস্থা আমাদের জাহাজের নয়। মৃত্যুর কথা অনেকবার মনে হল। চারি দিকেই তো মৃত্যু, দিগন্ত থেকে দিগন্ত পর্যন্ত মৃত্যু;

আমাদের প্রাণ এর মধ্যে এতটুকু। এই অতি ছোটোটার উপরেই কি সমস্ত আস্থা রাখব। আর এই এত বড়োটাকে কিছু বিশ্বাস করব না? বড়োর উপর ভরসা রাখাই ভালো"।[৫] জাপানের যাত্রাপথের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তাঁর মন কেড়ে নিয়েছিল। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অনুপম বর্ণনা তাঁর রচনায় প্রতিফলিত হয়েছে- "ওখানে মেঘে মেঘে রূপের এবং রঙের অহেতুক বিকাশ। এ যেন গানের আলোকের মতো, রূপ রঙের রাগ রাগিণীর আলাপ চলছে-তাল নেই, আকার আয়তনের বাঁধাবাঁধি নেই, কোনো অর্থবিশিষ্ট বাণী নেই, কেবলমাত্র মুক্ত সুরের লীলা। সেই সঙ্গে সমুদ্রের অপ্সরানৃত্য ও মুক্ত ছন্দের নাচ। তার মৃদঙ্গে যে বোল বাজছে তার ছন্দ এমন বিপুল যে, তার লয় খুঁজে পাওয়া যায়না। তাতে নৃত্যের উল্লাস আছে, অথচ নৃত্যের নিয়ম নেই"।[৬] তিনি হংকং বন্দরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যেরও অনুপম বর্ণনা দিয়েছেন। তাঁর ভাষায়- "মেঘ বৃষ্টি বাদল কুয়াশায় আকাশ ঝাপসা হয়ে আছে; হংকং বন্দরের পাহাড়গুলো দেখা দিয়েছে, তাদের গা বেয়ে বেয়ে ঝরনা ঝরে পড়ছে ,মনে হচ্ছে ,দৈত্যের দল সমুদ্রে ডুব দিয়ে তাদের ভিজে মাথা জলের উপর তুলেছে,তাদের জটা বেয়ে দাড়ি বেয়ে জল ঝরছে"।[৭]

জাপানীদের ধর্মের কথা বলতে গেলে আমরা বৌদ্ধধর্মের কথা বলতে পারি। কারণ আমরা এখানে বৌদ্ধধর্মের ঈঙ্গিত পেয়েছি। তিনি 'জাপান-যাত্রী' প্রবন্ধে বলেছেন- "সোমবার দিন সকালে আমার বন্ধুরা এখানকার বিখ্যাত বৌদ্ধ মন্দিরে নিয়ে গেলেন"।[৮] তিনি মন্দির দর্শনের সাথে সাথে বৌদ্ধ মন্দিরের এক সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন। বৌদ্ধ মন্দিরের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন- "মন্দিরের মধ্যে ঢুকতেই আমার মনে তেমনি একটি আনন্দের চমক লাগল; মনে হল, যাই হোক- না কেন, এটা ফাঁকা নয়, যেটুকু চোখে পড়ছে এ তার চেয়ে অনেক বেশি। সমস্ত রেঙ্গুন শহরটা এর কাছে ছোটো হয়ে গেল; বহুকালের বৃহৎ ব্রহ্মদেশ এই মন্দিরটুকুর মধ্যে আপনাকে প্রকাশ করলে।"[৯] তিনি শুধুমাত্র মন্দিরের ভেতরের বর্ণনা দিয়েছেন তা নয় তিনি মন্দিরের পারিপার্শ্বিক পরিবেশেরও একটা নিখুঁত চিত্র অঙ্কন করেছেন। তিনি বলেছেন- "থাকে থাকে প্রশস্থ সিঁড়ি উঠে চলেছে; তার উপরে আচ্ছাদন। এই সিঁড়ির দুই ধারে ফল ফুল বাতি, পূজার অর্ঘ্য বিক্রি চলছে। যারা বেচছে তারা অধিকাংশই ব্রহ্মীয় মেয়ে। ফুলের রঙের সঙ্গে তাদের রেশমের কাপড়ের রঙের মিল হয়ে মন্দিরের ছায়াটি সূর্যাস্তের আকাশের মতো বিচিত্র হয়ে উঠেছে। কেনাবেচার কোনো নিষেধ নেই, মুসলমান দোকানদারেরা বিলাতি মনিহারির দোকান খুলে বসে গেছে। মাছ মাংসেরও বিচার নেই, চারিদিকে খাওয়াদাওয়া ঘরকন্না চলছে।"[১০] তিনি মন্দিরের ভেতরের কারুকার্যেরও বর্ণনা দিয়েছেন মন্দিরের সাজসজ্জা, নৈবদ্য প্রতিমা সমস্ত কিছুর মধ্যে রয়েছে অসাধারণ কারুকার্যের নিদর্শন। জাপানের ধর্ম ছিল শিন্তোধর্ম, তিনি বলেছেন এই শিন্তোধর্ম ছিল সংস্কারমূলক। স্বদেশাসক্তিকে সুতীব্রভাবে জাগিয়ে তুলতে পারে এই শিন্তোধর্ম। ইউরোপ এবং ভারতবর্ষের মানুষ যখন তার অন্তরতম মানুষকে মানে তখন কিন্তু জাপান পরমার্থের সন্ধান করে না। কৃতকর্মকেই শ্রেষ্ঠজ্ঞানে পূজা করে।

তিনি জাপানের সমাজ ব্যবস্থার একটা দিকের কথা বলতে গিয়ে সমাজে স্ত্রী পুরুষের অবস্থান ও পুরুষদের জীবন যাত্রাকে পরিষ্কারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। তিনি বলেছেন- "লোকের কাছে শুনতে পাই এখানকার পুরুষেরা অলস ও আরামপ্রিয়, অন্য দেশের পুরুষের কাজ প্রায় সমস্তই এখানে মেয়েরা করে থাকে"।[১১] সমাজ ব্যবস্থার আরেকটি দিকের কথা বলতে গিয়ে নারী মানসিকতাকে তুলে ধরেছেন। তিনি সাঁওতাল মেয়েদের শারিরীক গঠন ও পরিশ্রমের কথা উল্লেখ করে মেয়েদের সামাজিক অবস্থানকে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। তাদের সকল প্রকার অঙ্গ ভঙ্গিতে মুক্তির একটা মহিমা প্রকাশিত হয়। তিনি বলেছেন- "এখানকার মেয়েরা সেই খাঁচা থেকে ছাড়া পেয়ে এমন পূর্ণতা এবং আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। তারা নিজের অস্তিত্ব নিয়ে নিজের কাছে সংকুচিত হয়ে নেই; রমণীয় লাবণ্যে যেমন তারা প্রেয়সী, শক্তির মুক্তিগৌরবে তেমনি তারা মহীয়সী"।[১২] তিনি জাপানি নারীর প্রেয়সী ,মহীয়সী রূপের কথা বললেও তিনি অপরদিকে উল্লেখ করেছেন মেয়েদের পুরুষদের কাছে অবহেলিত হওয়ার কথা। তিনি মন্তব্য করেছেন- "জাপানের মেয়েরা এখানকার পুরুষের কাছ থেকে সম্মান পায় না। সে-কথা সত্য কি মিথ্যা জানিনে, কিন্তু একটা সম্মান আছে সেটা বাইরে থেকে দেওয়া নয়, সেটা নিজের ভিতরকার, এখানকার মেয়েরাই জাপানের

বেশে জাপানের সম্মান রক্ষার ভার নিয়েছে।"[১৩] নারীরাই জাপানের সম্মান রক্ষার ভার নেওয়াই ব্যবসাবাণিজ্য সমস্ত ক্ষেত্রেই নারীরা অনেকটা এগিয়ে। তিনি এক জাপানি মহিলার ব্যবসা ও ব্যবসাতে সমৃদ্ধি লাভের সাথে সাথে কর্মকুশলতা, বুদ্ধিমত্তা ও চারিত্রিক দৃঢ়তার পরিচয় তুলে ধরেছেন। নারী মনের এই চারিত্রিক দৃঢ়তাই তাকে ব্যবসাতে সমৃদ্ধি এনে দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়- "বস্তুত, এই ব্যবসাটি এই স্ত্রীলোকেরই নিজের হাতে তৈরি। আমি যে কথা বলছিলুম এই ব্যবসায়ে তারই প্রমাণ দেখতে পাই। মানুষের মন বোঝা এবং মানুষের সঙ্গে সম্বন্ধ রক্ষা করা স্ত্রীলোকের স্বভাবসিদ্ধ; এই মেয়েটির মধ্যে আমরাই তার পরিচয় পেয়েছি। তার পরে, কর্মকুশলতা মেয়েদের স্বাভাবিক। পুরুষ স্বভাবত কুঁড়ে, দায়ে পড়ে তাদের কাজ করতে হয়। মেয়েদের মধ্যে একটা প্রাণের প্রাচুর্য আছে যার স্বাভাবিক বিকাশ হচ্ছে কর্মপরতা। কর্মের সমস্ত খুঁটিনাটি যে কেবল ওরা সহ্য করতে পারে তা নয়, তাতে ওরা আনন্দ পায়। তা ছাড়া দেনাপাওনা সম্বন্ধে ওরা সাবধানী"।[১৪] তিনি সর্বদা প্রাচ্যের সাথে পাশ্চাত্যের মানসিক সম্পর্কের ফাঁক ফোঁকরগুলি খুঁজে বেড়িয়েছেন। আর পাশ্চাত্যের সম্পর্কের কঠোরতাকে অকপটে রচনার মধ্যে লিপিবদ্ধ করেছেন। তাঁর লেখনী থেকে পাশ্চাত্যে মানুষের মধ্যে পারস্পরিক মানসিক চিত্রের চিত্র পেয়ে থাকি। তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন- "কাজের সম্বন্ধের ভিতর দিয়েও মানুষের সঙ্গে আত্মীয়তার সম্বন্ধ, এইটেই বোধ হয় আমাদের পূর্বদেশের জিনিস। পশ্চিমদেশ কাজকে খুব শক্ত করে খাড়া করে রাখে, সেখানে মানবসম্বন্ধের দাবী ঘেঁষতে পারে না"।[১৫] অপরদিকে তিনি আমাদের দেশের মানবসমাজের সম্বন্ধ ও আত্মীয়তার সম্বন্ধগুলিও তুলে ধরে মন্তব্য করেছেন- "প্রাচ্যদেশে মানবসমাজের সম্বন্ধগুলি বিচিত্র এবং গভীর। পূর্বপুরুষ যাঁরা মারা গিয়েছেন তাঁদের সঙ্গেও আমাদের সম্বন্ধ ছিন্ন হয় না। আমাদের আত্মীয়তার জাল বহুবিস্তৃত, এই নানা সম্বন্ধের নানা দাবি মেটানো চিরভ্যস্ত, সেই জন্যে তাতে আমাদের আনন্দ। আমাদের ভৃত্যেরাও কেবল বেতনের নয় ,আত্মীয়তার দাবি করে"।[১৬] তিনি বিশ্বাস করেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের এই বিস্তর অসামঞ্জস্য দূর করা হচ্ছে প্রকৃতির কাজ। জাপানে ঐ অসামঞ্জস্যতাকে দূর করার যজ্ঞ শুরু হয়েছে। তাই তিনি তাঁর লেখনীতে অকপটে স্বীকার করেছেন- "সম্ভবত, এখন আমরা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিস্তর অসামঞ্জস্য দেখতে পাব, যেটা কুশ্রী। আমাদের দেশেও পদে পদে তা দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু প্রকৃতির কাজই হচ্ছে অসামঞ্জস্যগুলোকে মিটিয়ে দেওয়া। জাপানে সেই কাজ চলছে সন্দেহ নেই। অন্তত এই জাহাজটুকুর মধ্যে আমি তো এই দুই ভাবের মিলনের চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি"।[১৭]

জাপানিদের চারিত্রিক বৈশিষ্টের প্রসঙ্গে চরিত্রের সংযম ও সৌন্দর্যপ্রিয়তা ও নিঃস্বার্থপরতার পরিচয় দিয়েছেন। নারী ও পুরুষের সমীপ্যের কোন গ্লানি তিনি খুঁজে পাননি। অন্যান্য সভ্য দেশে স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধ নিয়ে যে কৃত্রিম মোহবেষ্ঠন রচিত হয় জাপানে তা অনেক কম। তাই স্ত্রী- পুরুষের স্বাভাবিক সম্পর্ক মোহমুক্ত বলেই মনে হয়। তাদের সম্বন্ধের মধ্যে কোন লজ্জা ও আবিলতাও ছিল না। কারণ জাপানে স্ত্রী-পুরুষ একত্রে বিবস্ত্র হয়ে স্নান করতে পারতো। জাপানিদের এই মোহমুক্ত আবস্থা দেখে তিনি মন্তব্য করেছেন- "পৃথিবী তে যত সভ্য দেশ আছে তার মধ্যে কেবল জাপান মানুষের দেহ সম্বন্ধে যে মোহমুক্ত, এটা আমার কাছে খুব একটা বড়ো জিনিস বলে মনে হয়। অথচ আশ্চর্য এই যে, জাপানের ছবিতে উলঙ্গ স্ত্রীমূর্তি কোথাও দেখা যায়না। উলঙ্গতার গোপণীয়তা ওদের মনে রহস্যজাল বিস্তার করেনি বলেই এটা সম্ভবপর হয়েছে।"[১৮] জাপানিদের সংযত ও সহবত শিক্ষার পরিচয় দিয়েছেন এক বাড়িতে চায়ের নিমন্ত্রণে উপস্থিত হয়ে সেখানকার মেয়েদের তথা বাড়ির পরিবেশের দিকে লক্ষ্য রেখে মন্তব্য করেছেন- "তাঁর মেয়ে এসে নমস্কার করে চা তৈরিতে প্রবৃত্ত হলেন। তাঁর প্রবেশ থেকে আরম্ভ করে চা তৈরির প্রত্যেক অঙ্গ যেন কবিতার ছন্দের মতো। ধোয়া মোছা, আগুনজ্বালা, চা-দানির ঢাকা খোলা, গরম জলের পাত্র নামানো, পেয়ালায় চা ঢালা, সম্মুখে এগিয়ে দেওয়া, সমস্ত এমন সংযম এবং সৌন্দর্যে মণ্ডিত যে সে না দেখলে বোঝা যায় না। এই চা পানের প্রত্যেক আসবাবটি দুর্লভ এবং সুন্দর"।[১৯] জাপনিদের চরিত্রের আর একটি গুণ হল নিঃস্বার্থপরতা। তিনি তাঁর লেখনীতে জাপানিদের নিঃস্বার্থপরতার পরিচয় দিয়েছেন। আর এই নিঃস্বার্থপরতার গুণেই ভারতবর্ষের ঋণকে অকপটে স্বীকার করেছে। তিনি জানিয়েছেন- "জাপানিকেও দেখলে মনে হয়, তারা এক ধাতুতে গড়া নয়। পৃথিবীর অধিকাংশ জাতিই মিথ্যা করেও আপনার রক্তের অবিমিশ্রিতা নিয়ে গর্ব করে; জাপানের

মনে এই অভিমান কিছুমাত্র নেই। জাপানিদের সঙ্গে ভারতীয় জাতির মিশ্রণ হয়েছে। এ কথার আলোচনা তাদের কাগজে দেখেছি এবং তা নিয়ে কোনো পাঠক কিছুমাত্র বিচলিত হয়নি। শুধু তাই নয়, চিত্রকলা প্রভৃতি সম্বন্ধে ভারতবর্ষের কাছে তারা যে ঋণী সে কথা আমরা একেবারেই ভুলে গেছি, কিন্তু জাপানিরা এই ঋণ স্বীকার করতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না"।[২০] তিনি স্বীকার করেছেন জাপানের মানস প্রকৃতির চলনধর্মের কারণেই জাপান ভারতবর্ষ, চীন, কোরিয়া প্রভৃতি প্রতিবেশী দেশের কাছে সভ্যতার উপকরণ অনায়াসে গ্রহন করতে পারে। যা জাপানের অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করেছে। কারণ ইউরোপীয় সভ্যতা জঙ্গম মনের সভ্য। ক্রমাগত এই সভ্যতা নূতন চিন্তা ,নূতন চেতনা ,নূতন চেষ্টা ও নূতন পরীক্ষা লব্ধ ফলকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চায়। আর সে কারণেই জাপানের সভ্যতারও অগ্রগতি ঘটে চলেছে দিকে দিকে। তিনি জানিয়েছেন- "এশিয়ার মধ্যে একমাত্র জাপানের মনে সেই স্বাভাবিক চলনধর্ম থাকাতেই জাপান সহজেই য়ুরোপের ক্ষিপ্রতালে চলতে পেরেছে এবং তাতে করে তাকে প্রলয়ের আঘাত সইতে হয়নি। কারণ উপকরণ যে যা কিছু পাচ্ছে তার দ্বারা সে সৃষ্টি করছে; সুতরাং নিজের বর্ধিষ্ণু জীবনের সঙ্গে এ সমস্তকে সে মিলিয়ে নিতে পারছে"।[২১] তিনি জাপানে সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে জাপান শহরের পরিবর্তনকে সূচিত করেছেন।সমগ্র জাপান শহর আজ বড় বড় অট্টালিকায় ভরে গেছে। এই সভ্যতার পরিচয় দিতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন- "পৃথিবীর সকল সভ্য জাতই বর্তমান কালের ছাঁচে ঢালাই হয়ে একই রকম চেহেরা অথবা চেহেরার অভাব ধারণ করেছে। আমার এই জানলার বসে কোবে শহরের দিকে তাকিয়ে এই যা দেখছি এতো লোহার জাপান, এ তো রক্তমাংসের নয়।"[২২]

জাপানের মানুষ শান্তিপ্রিয়। তারা কোনসময় অযথা তর্কাতর্কি ও ঝগড়া ঝাঁটি পচ্ছন্দ করে না। পথ চলতে গেলে ভীড় হলেও তারা শান্তমনে রাস্তায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে ও এর জন্যে কাউকে দোষারোপ করে না। এই শান্তিপ্রয়তার ছবি তুলে ধরে বলেছেন- "চোখে পড়ে রাস্তায় লোকের ভিড় আছে, কিন্তু গোলমাল একেবারেই নেই। এরা যেন চেঁচাতে জানে না, লোকে বলে জাপানের ছেলেরা সুদ্ধ কাঁদে না। আমি এ পর্যন্ত একটি ছেলেকেও কাঁদতে দেখেনি"।[২৩] তাদের শান্তিপ্রিয়তা ও নিস্তব্দতার আর একটি চিত্র ফুটে উঠেছে ঘরের আসবাবপত্রের সাজসজ্জা দেখে। তিনি বলেছেন- "বাড়ির ভিতরকার সমস্ত ঘর ও পথ মাদুর দিয়ে মোড়া, সেই মাদুরের নীচে শক্ত খড়ের গদি; তাই এদের ঘরের মধ্যে যেমন পায়ের ধুলো পড়ে না, তেমনি পায়ের শব্দও হয় না। দরজাগুলো ঠেলা দরজা, বাতাসে যেন ধড়াধ্বড় পড়বে এমন সম্ভবনা নেই"।[২৪]

জাপানিরা সৌন্দর্যের পূজারি। তাদের ঘরের আসবাবপত্র থেকে ঘর সাজানো পর্যন্ত সবদিকে রয়েছে সৌন্দর্যের চিহ্ন। বাড়ির আভ্যন্তরীণ সৌন্দর্যের বর্ণনায় তিনি বলেছেন- "ঘরের একাধারে মাদুর নেই, সেখানে পালিশ করা কাষ্ঠখণ্ড ঝকঝক করছে, সেইদিকের দেয়ালে একটি ছবি ঝুলছে, এবং সেই ছবির সামনে সেই তক্তাটির উপর একটি ফুলদানির উপরে ফুল সাজানো। ঐ যে ছবিটি আছে ওটা আড়ম্বরের জন্যে নয়, ওটা দেখবার জন্যে।"[২৫] অর্থাৎ জাপানিরা যে সৌন্দর্যের পূজারি তা পরিষ্কারভাবে বোঝা যায়। তিনি জাপানে আধুনিকতার ছদ্মবেশের রহস্য ভেদ করে মানুষের হৃদয়ের সৃষ্টিকে বড়ো করে দেখেছেন। জাপান সর্বত্রই সুন্দরের কাছে মাথা নত করেছে। ঘরে বাইরে সর্বক্ষণ সুন্দরের-ই সেবা করেছে। তিনি বলেছেন- "কিন্তু জাপানে আধুনিকতার ছদ্মবেশ ভেদ করে যা চোখে পড়ে, সেহচ্ছে মানুষের হৃদয়ের সৃষ্টি। সে অহংকার নয়, আড়ম্বর নয়, সে পূজা। প্রতাপ নিজেকে প্রচার করে; এইজন্যে যতদ্দূর পারে বস্তুর আয়তনকে বাড়িয়ে তুলে আর সমস্তকে তার কাছে নত করতে চায়। কিন্তু পূজা আপনার চেয়ে বড়োকে প্রচার করে, এইজন্যে তার আয়োজন সুন্দর এবং খাঁটি, কেবলমাত্র মস্ত এবং অনেক নয়। জাপান আপনার ঘরে বাইরে সর্বত্র সুন্দরের কাছে আপন অর্ঘ্য নিবেদন করে দিচ্ছে"।[২৬] জাপানীদের সৌন্দর্যবোধের আরেকটি নমুনা তুলে ধরতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন- "এদের জীবনযাত্রায় এই রিক্ততা, বিরলতা, মিতাচার, কেবলমাত্র যদি অভাবাত্মক হত তাহলে সেটাকে প্রশংসা করবার কোনো হেতু থাকত না। কিন্তু এই তো দেখছি- এরা ঝগড়া করে না বটে অথচ প্রয়োজনের সময় প্রাণ দিতে, প্রাণ নিতে পিছপাও হয় না। জিনিসপত্রের

ব্যবহারে এদের সংযম, কিন্তু জিনিসপত্রের প্রতি প্রভুত্ব এদের কম নয়। সকল বিষয়ে এদের যেমন শক্তি তেমনি নৈপুণ্য, তেমনি সৌন্দর্যবোধ"।[২৭]

জাপানের শিল্প নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বিখ্যাত শিল্পিদের শিল্পকর্মের প্রশংসা করেছেন। তিনি রোকোয়ামা টাইক্কান এবং তানজান শিমোমুরার নাম করেছেন। এক শিল্পীবন্ধুর মুখে শুনা শিল্পকর্ম প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন- "রোকোয়ামা টাইক্কান এবং তানজান শিমোমুরা আধুনিক জাপানের দুই সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পী। তাঁরা আধুনিক য়ুরোপের নকল করে না, প্রাচীন জাপানেরও না, তাঁরা প্রথার বন্ধন থেকে জাপানের শিল্পকে মুক্তি দিয়েছেন। হারার বাড়িতে টাইক্কনের ছবি যখন প্রথম দেখলুম, আশ্চর্য হয়ে গেলুম। তাতে না আছে বাহুল্য না আছে শৌখিনতা। তাতে যেমন একটা জোর আছে তেমনি সংযম"।[২৮] শিমোমুরার একটা পটের কথা উল্লেখ করে তিনি জাপানের চিত্রশিল্পের আসল দিকটি তাঁর সামনে ফুটে উঠেছে। তিনি পটচিত্রের বিবরণটি উল্লেখ করে বলেছেন- "কাল শিমোমুরার আর একটা ছবি দেখলুম।পটের আয়তন তো ছোটো, অথচ ছবির বিষয় বিচিত্র। সাধক তার ঘরের মধ্যে বসে ধ্যান করছে; তার সমস্ত রিপুগুলি তাকে চারিদিকে আক্রমন করছে। অর্ধেক মানুষ অর্ধেক জন্তুর মতো তাদের আকার, অত্যন্ত কুৎসিত, তাদের কেউ যা খুব সমারোহ করে আসছে, কেউ বা আড়ালে আবডালে উঁকিঝুঁকি মারছে"।[২৯] এখানে পরিষ্কারভাবে দেখিয়েছ দেবতাকে উপলক্ষ করে মানুষ তার আপন রিপুর প্রবৃত্তির পূজায় ব্যস্ত। আপন প্রবৃত্তির তাড়নায় চাহিদা মেটাতেই সদাব্যস্ত। জাপানের শিল্পকলাকে শিক্ষা করার জন্য তিনি বাংলা দেশের শিল্পীদের জাপানে আহ্বান জানিয়েছেন। আহ্বান জানিয়ে বলেছেন- "বাংলাদেশের আজ শিল্পকলার নূতন অভ্যুদয় হয়েছে, আমি সেই শিল্পীদের জাপানে আহ্বান করেছি। নকল করবার জন্যে নয়, শিক্ষা করবার জন্যে। শিল্প জিনিসটা যে কতো বড়ো জিনিস, সমস্ত জাতির সেটা যে কত বড়ো জিনিস, সমস্ত জাতির সেটা যে কত বড়ো সম্পদ, কেবলমাত্র শৌখিনতাকে সে যে কতদূর পর্যন্ত ছাড়িয়ে গেছে-তার মধ্যে জ্ঞানীর জ্ঞান, ভক্তের ভক্তি, রসিকের রসবোধ যে কত গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে আপনাকে প্রকাশ করার চেষ্টা করেছে। তা এখানে এলে স্পষ্ট বোঝা যায়"।[৩০] জাপান শিল্পকলাকে সমস্ত প্রথার বন্ধন থেকে মুক্তি দিতে পেরেছে, এই শিল্পের অন্যতম বৈশিষ্টের হল বাহুল্যহীনতা আর আছে সংযম।

জাপানের সাংস্কৃতিক দিকটি আলোচনা করতে গিয়ে নৃত্যানুষ্ঠানের কথা বলেছেন। তিনি একটি জাপানী নাচের সুন্দর বর্ণনা দিয়ে তাদের সাংস্কৃতিক দিকটির বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন- "একদিন জাপানি নাচ দেখে এলুম, মনে হল, এ যেন দেহভঙ্গির সংগীত। এই সংগীত আমাদের দেশের বীণার আলাপ। অর্থাৎ পদে পদে ভিড়। ভঙ্গি বৈচিত্রের পরস্পরের মাঝখানে কোনো ফাঁক নেই কিংবা কোথাও জোড়ের চিহ্ন দেখা যায় না; সমস্ত দেহ পুষ্পিত লতার মতো একসঙ্গে দুলতে দুলতে সৌন্দর্যের পুষ্পবৃষ্টি করছে"।[৩১] তিনি ইউরোপীয় নাচের সঙ্গে জাপানি নাচের পার্থক্য খুঁজে পেয়েছেন। এবং জাপানি নাচকে পরিপূর্ণ নাচ বলে স্বীকার করেছেন। এই নাচের মধ্যে তিনি দেহের সৌন্দর্যলীলার সঙ্গে লালসার কোন চিহ্ন দেখতে পাননি।

জাপানের সাহিত্য সহজ, সরল। তিন লাইনে ওদের কবি পাঠক ও সকলের কাছেই যথেষ্ট। জাপানীদের অন্তরের সমস্ত প্রকাশ সৌন্দর্যবোধে।সাহিত্যের কথা বলতে গিয়ে বলেন-

"পুরানো পুকুর ,
ব্যাঙের লাফ,
জলের শব্দ"।[৩২]

এখানে ফুটে উঠেছে পুকুরের নিস্তব্ধতা। পুরানো পুকুর মানুষের পরিত্যক্ত, নিস্তব্ধতা ও অন্ধকারস্থান, সেখানে একটা ব্যাঙ লাফিয়ে পড়তেই শব্দ শোনা যাওয়াতে বোঝাই যাচ্ছে পুকুরটা কিরকম নিস্তব্ধ ছিল। এখানে বড় হয়ে উঠেছে পুকুরের নিস্তব্ধতায়। জাপানের সাহিত্য চর্চার কথা বলতে গিয়ে জাপানের সঙ্গে ভারতবর্ষের সাহিত্যের তুলনা করেছেন-

"স্বর্গ এবং মর্ত হচ্ছে ফুল

দেবতারা এবং বুদ্ধ হচ্ছেন ফুল
মানুষের হৃদয় হচ্ছে ফুলের অন্তরাত্মা।

আমার মনে হয়, কবিতাটিতে জাপানের সঙ্গে ভারতবর্ষের মিল রয়েছে। জাপান স্বর্গমর্তকে বিকশিত ফুলের মতো সুন্দর করে দেখছে। ভারতবর্ষ বলছে- "এই যে এক বৃন্তে দুই ফুল, স্বর্গ এবং মর্ত, দেবতা এবং বুদ্ধ-মানুষের হৃদয় যদি না থাকত তবে এ ফুল কেবলমাত্র বাইরের জিনিস হত-এই সুন্দরের সৌন্দর্যটিই হচ্ছে মানুষের হৃদয়ের মধ্যে"।[৩৩] এখানে তিনি মিল খুঁজে পেয়েছেন, জাপান স্বর্গ-মর্তকে বিকশিত ফুলের সঙ্গে তুলনা করেছেন। আর ভারতবর্ষের কবিতায় বলা হয়েছে-একবৃন্তে দুই ফুল স্বর্গ এবং মর্ত, দেবতা এবং বুদ্ধ। আরও বলেছে মানুষের হৃদয় না থাকলে এ ফুল তবে বাইরের জিনিস হত। আর ফুলের সৌন্দর্যটাই নিহিত হয়েছে মানুষের হৃদয়ের মধ্যে।

জাপান ভ্রমণ সংক্রান্ত তথ্য থেকে জানতে পারি যে তিনি জাপানের সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে ইউরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির অমিল লক্ষ্য করেছেন। জাপান ইউরোপের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে সদাব্যস্ত। কিন্তু মূল একটা জায়গায় ইউরোপের আদর্শের সঙ্গে জাপানের আদর্শের অমিল রয়েছে। তিনি এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন- "জাপান ইউরোপের কাছ থেকে কর্মের শিক্ষা আর অস্ত্রের দীক্ষা গ্রহণ করেছে। তার কাছ থেকে বিজ্ঞানের শিক্ষাও সে লাভ করতে বসেছে। কিন্তু আমি যতটা দেখেছি তাতে আমার মনে হয় য়ুরোপের সঙ্গে জাপানের একটা অন্তরতর জায়গায় অনৈক্য আছে। যে গূঢ় ভিত্তির উপরে য়ুরোপের মহত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত সেটা আধ্যাত্মিক সেটা কেবলমাত্র কর্মনৈপুণ্য নয়, সেটা তার নৈতিক আদর্শ"।[৩৪] জাপানের সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারা ভারতবর্ষ যদি গ্রহণ করতে পারতো তাহলে ভারতবর্ষ গৌরবান্বিত হত একথা তিনি স্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন "আমি নিজের কথা বলতে পারি ,আমদের জীবনযাত্রার উপযোগী জিনিস আমরা এখান থেকে যত নিতে পারি এমন য়ুরোপ থেকে নয়। তা ছাড়া জীবনযাত্রার রীতি যদি অসংকোচে জাপানের কাছ থকে শিখে নিতে পারতুম ,তাহলে আমাদের ঘরদুয়ার এবং ব্যবহার শুচি হত, সুন্দর হত, সংযত হত"।[৩৫] তিনি জাপানের উন্নতির মূল সোপান হিসেবে ধ্যানের সাধনার কথা উল্লেখ করেছেন। ১৯২৯ সালে জাপান ভ্রমনের প্রসঙ্গে রচনা করেন 'ধ্যানীজাপান' প্রবন্ধ। এই 'ধ্যানীজাপান' প্রবন্ধে তিনি জাপানিদের ধ্যানের সাধনার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। ধ্যানেই যে জাপানিদের জীবনচর্চার অঙ্গ, এই ধ্যানে তাদের আত্মশক্তির জাগরণ ঘটিয়ে তাদের মনোজগতের বিপুল পরিবর্তন আনতে সক্ষম হচ্ছে। ডঃ সন্তোষকুমার মন্ডল মন্তব্য করেছেন- "জাপানে ধ্যানের মাধ্যমে যে সংযমের সাধনা তা কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক নয়, আধিভৌতিক ও বটে। এক কথায় জাপানিদের সমস্ত জীবন ধ্যানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় বলেই তারা এমন সংযত, সুন্দর ও ঐশ্বর্যবান সংস্কৃতি গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে"।[৩৬] জাপান যাত্রা বিষয়ক রচনাগুলি থেকে জাপান দেশের ঐতিহ্য ও ভাবধারার সাদৃশ্য বৈসাদৃশ্য সহজেই ধরা পড়ে ।আর ঐ তুলনামূলক আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতেই হয়তো নিজেদের ভাবধারার ঐতিহ্যকে আরও সুন্দরভাবে ও মহত্তর করে তোলার প্রেরণা লাভ করবে।

তথ্য সূত্র :

রচনা **পৃষ্ঠা সংখ্যা**

১) লস এঞ্জেলেস থেকে ১১ অক্টোবর ১৯১৬ তারিখে পুত্র রথীন্দ্রনাথকে লেখা একটি চিঠি
২) 'রবীন্দ্ররচনাবলী'-বিশ্বভারতী - 'কল্পনা' 'রাত্রি' ১৬৪ (চতুর্থ খণ্ড)
৩) 'রবীন্দ্রজীবনী' - প্রভাতকুমার মুখ্যোপাধ্যায় -চতুর্থ খণ্ড - 'জাপানে একমাস' - ১৯৭
৪) রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণ সাহিত্য, ডঃ সন্তোষকুমার মণ্ডল, ১ম সংস্করণ,উদ্দালক সাহিত্য প্রকাশন ৪৩
৫) 'জাপান-যাত্রী' - তৃতীয় পরিচ্ছেদ ৪০০ (দশম খণ্ড)
৬) 'জাপান-যাত্রী' - ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ৪০৬ (দশম খণ্ড)

৭) 'জাপান-যাত্রী' - একাদশ পরিচ্ছেদ ৪১৬ ঐ
৮) ঐ - চতুর্থ পরিচ্ছেদ ৪০৩ ঐ
৯) ঐ চতুর্থ পরিচ্ছেদ ৪০৩ (দশম খণ্ড)
১০) ঐ ঐ ৪০৩ (দশম খণ্ড)
১১) 'জাপান-যাত্রী' ঐ ৪০৪ ঐ
১২) 'জাপান-যাত্রী' - চতুর্থ পরিচ্ছেদ ৪০৪ (দশম খণ্ড)
১৩) ঐ -ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ ৪২২ (দশম খণ্ড)
১৪) ঐ নবম পরিচ্ছেদ ৪১৩ ঐ
১৫) ঐ অষ্টম পরিচ্ছেদ ৪১১ ঐ
১৬)'জাপান-যাত্রী' ঐ ৪১১ (দশম খণ্ড)
১৭) ঐ ঐ ৪১১ (দশম খণ্ড)
১৮) ঐ ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ ৪২৫ (দশম খণ্ড)
১৯) ঐ ঐ ৪২৫ (দশম খণ্ড)
২০) ঐ পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ ৪৩৩ (দশম খণ্ড)
২১) 'জাপান-যাত্রী' ঐ ৪৩৩ (দশম খণ্ড)
২২) ঐ ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ ৪২১ (দশম খণ্ড)
২৩) ঐ ঐ ৪২২ (দশম খণ্ড)
২৪) ঐ চতুর্থদশ পরিচ্ছেদ ৪২৭ (দশম খণ্ড)
২৫) 'জাপান-যাত্রী' ঐ ৪২৭ ঐ
২৬) ঐ ঐ ৪২৯ ঐ
২৭) ঐ ঐ ৪২৮ ঐ
২৮) ঐ ঐ ৪৩০ (দশম খণ্ড)
২৯) 'জাপান-যাত্রী' চতুর্দশ পরিচ্ছদ ৪৩১ ঐ
৩০) ঐ ঐ ৪৩০ ঐ
৩১) ঐ ঐ ৪২৮ ঐ
৩২) ঐ ত্রয়োদশ পরিচ্ছদ ৪২৩ ঐ
৩৩) ঐ ঐ ৪২৩ (দশম খণ্ড)
৩৪) 'জাপান-যাত্রী' পঞ্চদশ ৪৩৫ ঐ
৩৫) ঐ চতুর্দশ ৪৩০ ঐ
৩৬) রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণ সাহিত্য -১ম সংস্করণ উদ্দালক প্রকাশন ডঃ সন্তোষকুমার মণ্ডল ১৩৩

সহায়ক গ্রন্থাবলী :

১। আকর গ্রন্থঃ 'রবীন্দ্ররচনাবলী' (বিশ্বভারতী)
প্রকাশক–কুমকুম ভট্টাচার্য
১২৫তম রবীন্দ্রজন্মজয়োন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ।

২। সহায়ক গ্রন্থপঞ্জীঃ
ক। 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' সুকুমার সেন (পাঁচ খণ্ড)
চতুর্থ খণ্ড প্রকাশক–সুবির কুমার মিত্র–প্রথম আনন্দ সংস্করণ জানুয়ারি -১৯৯৬

খ। ‘রবীন্দ্রজীবনী’-প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (চার খণ্ড)
১ম খণ্ড প্রকাশক-কুমকুম ভট্টাচার্য-ষষ্ঠ সংস্করণ ভাদ্র ১৪১৭
২য় খণ্ড প্রকাশক-শ্রীরামকুমার মুখোপাধ্যায়-১ম সংস্করণ
৩য় খণ্ড প্রকাশক-কুমকুম ভট্টাচার্য-পঞ্চম সংস্করণ-শ্রাবণ ১৪১৫
৪র্থ খণ্ড প্রকাশক-কুমকুম ভট্টাচার্য-চতুথ সংস্করণ ১৪১৭

গ। ‘রবিজীবনী’-প্রশান্তকুমার পাল (নয় খণ্ড)
অষ্টম খণ্ড প্রকাশক-সুবিরকুমার মিত্র-প্রথম সংস্করণ মাঘ ১৪০৭
নবম খণ্ড প্রকাশক-সুবিরকুমার মিত্র-প্রথম সংস্করণ মে ২০০৩

ঘ। ‘রবিরশ্মি’-চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (দু’খণ্ড)
২য় খণ্ড প্রকাশক-সমীরণ চৌধুরী
তৃতীয় কলেজ স্ট্রীট সংস্করণ ১৪১৭

ঙ। ‘রবীন্দ্র বিচিত্রা’-প্রমথনাথ বিশী

চ। ‘রবীন্দ্রায়ণ’-পুলিন বিহারী সেন (দু’খণ্ড)
২য় খণ্ড প্রকাশক-স্বপনকুমার মুখোপাধ্যায়
রবীন্দ্র জন্ম শতবষ পূতি উপলক্ষে রচনাঘ্য ১২ই পৌষ ১৪১৪

ছ। ‘রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণসাহিত্য’-সন্তোষকুমার মন্ডল
প্রকাশক-উদ্দালক সাহিত্য প্রকাশন,১ম প্রকাশ জানুয়ারি ২০০৩।